Vol. 45 | No. 1 | 2001

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

# বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ (১৯৪৭-১৯৮৭)

| | |
|---|---|
| Volume | 45 |
| Issue | 1 |
| Year | 2001 |
| ISSN | 0558-1583 |
| eISSN | 3006-886X |
| Author(s) | Soumitra Sekhar |
| Published online | October 1, 2001 |
| DOI | 10.62328/sp.v45i1.7 |
| Link to article | https://doi.org/10.62328/sp.v45i1.7 |
| Pages | ১৫৪-১৬০ |
| Publisher | University of Dhaka |
| Copyright | সাহিত্য পত্রিকা |
| Designed and Developed by | Zobayer Abdullah |

 Check for updates

# বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ

## (১৯৪৭-১৯৮৭)

## রফিকউল্লাহ খান

**প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৯৭, জ্যৈষ্ঠ ১৪০৪**

**বাংলা একাডেমী, ঢাকা**

**প্রচ্ছদ : উৎপল দাস ❑ মূল্য : একশত ত্রিশ টাকা মাত্র**

বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্যে বিশেষত এর উপন্যাস বিষয়ক আলোচনা- সমালোচনা অদ্যাপি যে খুব একটা কম হয়েছে, তেমন নয়। কিন্তু মৌলিক গবেষণার দিক থেকে প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেনের গ্রন্থভুক্ত ও পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলো আর প্রফেসর ইদরিস আলির দুটো বই ছাড়া উল্লেখ করার মতো কোন নির্ভরশীল কাজ আছে বলে মনে হয় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান এই ঊষরতায় মরূদ্যানের মতো 'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' গ্রন্থ নিয়ে এগিয়ে এলেন। এটি তাঁর ডি, ফিল উপাধি প্রাপ্তির গবেষণা অভিসন্দর্ভের গ্রন্থরূপ। প্রফেসর সৈয়দ আকরম হোসেনের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন এই গবেষণায় ১৯৪৭ থেকে ১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ অবধি বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাসের একই সঙ্গে বিষয় ও শিল্পরূপগত বিশ্লেষণ-অনুসন্ধান পাওয়া যায়।

ডি, এইচ, লরেন্স উপন্যাসকে বলেছেন : ওয়ান ব্রাইট বুক অফ্ লাইফ। 'বুক অফ্ লাইফ', কিন্তু 'ব্রাইট' অর্থাৎ এখানে থাকবে জীবনের সমগ্রতা, তার ভালো-মন্দ উচ্চ-নিচু, শ্রী-কু সব মিলিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে সময়ের বিস্তার এবং চারদিকের জঙ্গমও

এতে হয়ে উঠবে ক্রিয়াশীল। অধ্যাপক খান পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাসের বিষয়-স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের উৎস-মুখ অনুসন্ধান করতে গিয়ে সঙ্গত কারণেই করেছেন এই পরিপ্রেক্ষিতের উল্লেখ : 'উপন্যাস যেহেতু জীবনের সমগ্রতা-স্পর্শী শিল্প-আঙ্গিক, সে কারণে সমাজজীবনের অন্তর-বাহিরের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা ও অভিজ্ঞানের রূপায়ণই তার স্বধর্ম। কারণ সময় ও সমাজ চেতনা পরিশ্রুত ব্যক্তিচৈতন্যের স্তরময় আত্মপ্রকাশ আকাঙ্ক্ষা এবং তার সামাজিকীকরণের অনিবার্যতাবোধ থেকেই শিল্প-সাহিত্যের সৃষ্টি। আর উপন্যাস শিল্প উদ্ভবের পেছনে কাজ করেছে সমাজ গঠন, আর্থ-উৎপাদন কাঠামো, জীবন অবলোকনের সমগ্রতাবোধ এবং অস্তিত্ব জিজ্ঞাসার দ্বন্দ্বময় ক্রমবিকাশের সঙ্গে সংলগ্ন শিল্প-অভিপ্রায়। উৎপাদন-কাঠামো ও জীবন বিন্যাসের স্বাতন্ত্র্যের কারণেই বাংলাদেশের উপন্যাসকে নির্বাচন করতে হয়েছে স্বতন্ত্র বিষয় ; এবং সন্ধান করতে হয়েছে অনিবার্য রূপাঙ্গিক।" (পৃ. ২৪-২৫)

সমাজ-রাজনীতির নানা চড়াই-উতরাই অতিক্রম করে আজকের বাংলাদেশের বাংলা সাহিত্য গড়ে উঠলেও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারায় সেই চর্যাপদের সঙ্গেই এর নাড়ির অভিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। তার পরও প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে বাংলাদেশী বাংলা সাহিত্যের মোড় ফেরা নিয়ে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তি ও আমাদের পাকিস্তান প্রাপ্তির মাধ্যমে আজকের বাংলাদেশী সাহিত্যের মোড় ফিরেছে বলেই আমরা সবাই মেনে নিয়েছি বা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছি। একেতো অবিকশিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী, অন্যদিকে সমাজ ব্যবস্থার সুনির্দিষ্ট কাঠামোহীনতা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানী ঔপন্যাসিকদের চিন্তায় সুনির্দিষ্টতা এনে দেয় নি। র‍্যাল্ফ ফক্সের মন্তব্যকে যদি স্মরণ করি, তাহলে বলতে হয় যে, উপন্যাস হলো আধুনিক বুর্জোয়া সমাজব্যবস্থায় জীবনের মহাকাব্য। ওই সময় বাংলাদেশ যেহেতু আধা সামন্তবাদী সমাজব্যবস্থার চেয়ে উন্নত নয়, সেহেতু মান ও গুণগত দিক থেকে উপন্যাসও হয়ে উঠে নি পরিপূর্ণ ও আধুনিক। ঐ সময় থেকে আজ অবধি দেখা যায়, সংখ্যায় যতো উপন্যাস রচিত হয়েছে এই বাংলাদেশে, শিল্প নৈপুণ্যে উৎসে উঠেছে সে তুলনায় অনেক কম। এটাতো ঠিক, ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যচেতনার দ্বারাই ১৯৪৭-এ আজকের বাংলাদেশে বাংলাসাহিত্য তথা উপন্যাসের মোড় ফেরা। নইলে তারাশঙ্কর, মানিক, বিভূতিভূষণ এর সাহিত্যিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার পরিত্যাগ করে গ্রহণ করা হলো নজিবর, ওদুদ, কাজী ইমদাদুল হককে! এই সাম্প্রদায়িক ও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যই বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাসের পশ্চাৎগামিতার অন্যতম প্রধান কারণ।

সংস্কৃতি-রাজনীতির অন্তর্ভুক্ত না করে এ বিষয়গুলো বিবেচনা করা যাবে না। ডঃ রফিকউল্লাহ খানের লক্ষ্য অবশ্য সেদিকেই, গবেষণা গ্রন্থটি তার প্রমাণ। এখানে দেখা যায়, 'বাংলাদেশের উপন্যাস: পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষনামে দীর্ঘ চল্লিশ পৃষ্ঠাব্যাপী ১৭৯৩-এর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত থেকে ভারত ভাগের (১৯৪৭) পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘসময় আলোচনা করে বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠার ইতিহাস বিবৃত করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ডঃ খান মন্তব্য করেন : 'বাংলাদেশের মধ্যবিত্তশ্রেণী তখনও ছিলো অনভিজ্ঞ ও অপরিণত।' (পৃ. ৩১)-এর সম্পূরক কারণ তিনি নানা নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে তথ্য উৎকলন করে ব্যাখ্যা করেছেন। মাতৃভূমি ভারতকে একসময় 'দারুল হর্‌ব' বা শত্রুভূমি ঘোষণা করে এখানে নমাজ শাস্ত্রসম্মত নয়– এমন ফতোয়া দেওয়া হয়েছিলো। এরকম নেতিবাচক মনোভঙ্গির বিপরীতে ইতিবাচক ক্রিয়া সংগঠনে বেশ বিলম্ব হয়। বাঙালি মুসলিমদের মানস গঠনেও এই নেতি-ইতির অভিঘাত এসে পড়ে। সময়ের অনিবার্য প্রয়োজনকে স্বীকার ও দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়তাকে আত্তীকরণের ফলে এ সময়ের উপন্যাসেও এর প্রভাব পড়ে অনিবার্যভাবে।

আলোচিত গবেষণা গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ের 'পরিপ্রেক্ষিত' শীর্ষনামের পরিচ্ছেদগুলো একত্র করলে আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পাওয়া যাবে। তথ্য সংকলন ও পরিবেশনে এক্ষেত্রে গবেষকের নিবিষ্টতার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে যে জিনিসটি ইঙ্গিত আছে, এবং যা বর্তমান গ্রন্থভুক্ত বিষয়ের জন্যে অত্যাবশ্যক তা হলো রাজনীতির সামাজিক প্রতিক্রিয়া আর সাহিত্যিক মিথষ্ক্রিয়া। অধীত বিদ্যা ও পারিপার্শ্বিক লব্ধজ্ঞান থেকে আমাদের এ বোধ জন্মেছে, ক্রিস্টোফার কডওয়েলের সেই বিশ্লেষণ ধরে যে, মুক্তো যেমন শুক্তির উৎপন্ন, সাহিত্যও তেমনি সমাজজাত। একটিকে বাদ দিলে অপরটির অস্তিত্ব প্রায় অস্বীকারই করা হয়।

১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ থেকে চার দশকের বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাস আলোচনা করতে গিয়ে অধ্যাপক খান ১৯৪৭-'৫৮-'৭১-'৮৭ এই তিনভাগে সময়কে ভাগ করে নিয়েছেন। উল্লেখ্য ১৯৫৮-এ আইয়ুবি ফৌজি আইন জারি ও '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধকে অন্তর্বর্তী কারণ হিসাবে ধরে চার দশকের এ বিভক্তি। এখানে প্রতিটি ভাগের উপন্যাসের কতিপয় সাধারণ প্রবণতা, আঙ্গিক কারুকলা এবং বিশেষ-বৈশিষ্ট্য ও আধারের চারুপাঠ শনাক্ত করা হয়েছে। প্রথমভাগের 'পরিপ্রেক্ষিত' আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাংলাদেশকে 'পাকিস্তান শাসিত বাংলাদেশ' হিসাবে উল্লেখ

করেছেন। শুধু উল্লেখই নয়, তিনি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশ মুক্তির প্রত্যাশায়, অর্থনৈতিকভাবে বেড়ে উঠার তাগিদে যে আন্দোলন-সংগ্রাম করেছে, ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রটিতে সেই প্রত্যাশার প্রাপ্তি শূন্য থেকে শূন্যতরে নেমে গেছে। তাঁর এই বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের যে-কোন গবেষকের উপাত্তের খোরাক জোগাবে বলে বিশ্বাস জন্মে। তিনি উল্লেখ করেছেন: 'যারা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলাভাষার দাবি উত্থাপন করেছিলেন তাদের উদ্দেশে তিনি [গভর্ণর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ] ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অন্য কোন ভাষা নয়।' যারা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা দাবি উত্থাপন করেছিলেন তাদের উদ্দেশে তিনি এদুটি ভাষণে এবং ২৮ শে মার্চে করাচি প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে পূর্ব বঙ্গবাসীদের উদ্দেশে এক বেতার ভাষণে পুনঃপুনঃ বিদেশী এজেন্সির সাহায্যপুষ্ট, কমিউনিস্ট, পাকিস্তানের শত্রু, সংহতি বিনষ্টকারী, প্রাদেশিকতার উস্কানিদাতা, শান্তি বিনষ্টকারী, রাজনৈতিক অন্তর্ঘাতক, ঘরোয়াশত্রু, বিশ্বাসঘাতক, রাজনৈতিক সুবিধাবাদী, বোকার স্বর্গে বসবাসকারী, স্বার্থপর, পঞ্চমবাহিনী ইত্যাদি বহু তিরস্কার বর্ষণ করেন।' (পৃ. ৪৬)

লক্ষ করলে দেখা যাবে, বর্তমান রাজনৈতিক অঙ্গনেও 'দেশ বিক্রি', 'আগ্রাসনের প্রতিবাদ', 'প্রভুদেশের ইঙ্গিত' ইত্যাদি ভাষায় কতিপয় রাজনৈতিক দল সেই একই বক্তব্য প্রদান করে সাধারণ নীরিহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত। আসলে এরা জিন্নাহ ও তাঁর মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বর্তমান উত্তরসূরি। ১৯৪৭-'৫৮ এই সময়ে বাঙালিদের মধ্যে স্বাধীন পুঁজি গড়ে উঠে নি; কিছু মুৎসুদ্দি পুঁজি ও মধ্যস্বত্ব ভোগের ফলে অর্জিত ধন ছাড়া। বুদ্ধিজীবীদের ক্ষেত্রে মননশীল স্বাধীন বুদ্ধিবৃত্তি কোন সুনির্দিষ্টতা অর্জন করে নি। এ কারণগুলো বিবেচনায় রেখে অধ্যাপক খানের মূল্যায়ন: 'মধ্যবিত্তের প্রত্যাশা অপ্রাপ্তি, সংগ্রাম, স্বপ্ন স্বপ্ন ভঙ্গ এ-পর্যায়ে রচিত উপন্যাসের মৌল উপজীব্য। বিকাশশীল মধ্যবিত্তের অশক্ত, অপরিণত ভিত্তি উপকরণের প্রশ্নে ঔপন্যাসিকদেরকে করেছে গ্রামজীবনমুখী। বিষয় ভাবনায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বময় প্রকাশ। একদিকে সামন্ত আর্থ উৎপাদন কাঠামোর পিছুটান, অন্যদিকে বিকাশকামী মধ্যবিত্তের কর্মোদ্যোগ, সংগ্রাম ও স্বাবলম্বন-প্রত্যাশা— এ দুয়ের অনিবার্য দ্বন্দ্ব উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপকেও প্রভাবিত করেছে।' (পৃ. ৫৪) এ সময়ের উপন্যাসে 'গ্রামীণ বাস্তবতার স্বরূপ' এবং 'মধ্যবিত্তের সমাজ দর্শন ও অস্তিত্ব জিজ্ঞাসা'–বিষয়ের ক্ষেত্রে এই দ্বিমাত্রিকতা আর আঙ্গিকের ক্ষেত্রে প্রথাগত প্রকরণের পাশাপাশি 'আধুনিক'

শিল্পরীতি চর্চা হতে দেখা যায়। সাতজন লেখকের নয়টি উপন্যাস এ পর্বে আলোচনার জন্যে গৃহীত হয়েছে। পরবর্তী পাঠে সতের জন ঔপন্যাসিকের ছত্রিশটি উপন্যাস আলোচনায় এসেছে। এখানেও পরিপ্রেক্ষিত শীর্ষনামে তৎকালীন আন্দোলন-সংগ্রামে উত্তপ্ত বাংলাদেশ ও তার সমাজকাঠামো ধরা পড়ছে একটি নির্দিষ্ট আধারে। অধ্যাপক রফিকউল্লাহ লিখেছেন : 'শোষণ, নিপীড়ন, প্রতিবাদ, রক্তক্ষরণ ও দ্রোহ এ-পর্যায়ের সমাজ চৈতন্যকে যেমন করেছে অস্থির ও দ্বন্দ্ব-রক্তিম তেমনি, সমাজবিকাশ প্রক্রিয়ার বহুভুজ জটিলতা শিল্পীর আত্মপ্রকাশকেও করেছে তার অনুগামী। ব্যক্তি ও সমষ্টি-অস্তিত্বের বহুমুখী সংকটে বাংলা দেশের শিল্পীচিত্ত হয়ে উঠেছে উদ্বেগাকুল, জাতিসত্তার প্রশ্নে সতর্ক ও সন্ধানী এবং অভিসার বিচিত্র রূপকল্প সৃজনে ঐকান্তিক। সমাজজীবনের অন্তর-বাহিরের বৈপরীত্যময় সত্যের সমগ্রতা সন্ধানের মধ্যে নিহিত রয়েছে এ পর্যায়ে রচিত উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্য।' (পৃ.১১৫) উপন্যাসের বিষয়ের ক্ষেত্রে এ সময় কয়েকটি ধারা লক্ষ করা যায় :

(১) গ্রামীণ জীবন-সংঘাতের রূপ ও রূপান্তর

(২) মধ্যবিত্তের অস্তিত্বজিজ্ঞাসার বৈচিত্র্য

(৩) মনোমুখিতা: নৈরাশ্য অন্তর্যাতনা ও মনোবিকলন

(৪) রাজনৈতিক চেতনা– শিল্পী রূপগত দিক থেকে ও প্রথাগত আঙ্গিকের পাশাপাশি এসেছে বিশ্বযুদ্ধোত্তর শিল্পরীতির চর্চা।

মনোজাগতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিঃসঙ্গ অস্তিচেতনা ইত্যাদি এ সময়ের বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাস ধারণ করে বলে উপন্যাস শরীরেও ফুটে উঠেছে তার লক্ষণ। অধ্যাপক খান তাঁর আলোচনায় এ বিষয় ও লক্ষণগুলো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেছেন।

গ্রন্থের শেষ অধ্যায় 'বাংলাদেশের উপন্যাস : বিষয় ও শিল্পরূপ' শীর্ষক। এখানেও যথারীতি 'পরিপ্রেক্ষিত' শিরোনামে স্বাধীন বাংলাদেশের দ্বন্দ্বমুখর সমাজ রাজনীতির বিশ্লেষণ আছে। তবে গবেষক এই সময়কে দুটো আন্তঃপর্বে বিভক্ত করে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৭১-'৭৫ পর্যন্ত সময়কে তিনি অভিহিত করেছেন 'সংগ্রাম-স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাল' হিসেবে। যদি তাই হয়, তাহলে তো সৈয়দ আকরম হোসেনের ভাষায়- ১৯৭৫-'৮৭ সময় সম্পর্কে বলতে হয় :

'দৃশ্য-অদৃশ্য সব ষড়যন্ত্রে আবার আমরা গড়িয়ে পড়েছি সূচনা বিন্দুর অন্ধকারে।' (প্রসঙ্গ: কথা সাহিত্য, ১৯৯৭, ঢাকা, পৃ. ১২৮) বলা বাহুল্য নয়, তাঁর প্রত্যাশা মতোই বর্তমান সময় সম্ভবত ইঙ্গিত দেয়, বিজয়ী সিসিফাস মানসিকতায়। কিন্তু এ কথা তো সত্য যে, ১৯৭৫-এর পট পরিবর্তন বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাসের স্বাভাবিক গতির ক্ষেত্রে এনে দেয় এক স্থবিরতা। এ ক্ষেত্রে অনেকেই একপা এগুতে দুপা পেছনোর লেনিনীয় রীতি অবলম্বন করেছিলেন। এতে কেউ সঙ্গতি সামঞ্জস্য রাখতে পেরেছেন, কেউ ব্যর্থ হয়েছেন। অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খান এ সময়ের উপন্যাস সম্পর্কে বলেছেন : 'মুক্তিযুদ্ধের গৌরব-দীপ্ত চেতনা ঔপন্যাসিকের সৃজন প্রেরণা, মন ও মননে নিঃসন্দেহে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিলো। তাঁদের অভিজ্ঞতা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের দিগন্ত হয়েছিলো সুবিস্তৃত। কিন্তু যুদ্ধোত্তর কয়েক বছরের মধ্যেই জাতীয় জীবনে যে পরাজয় ক্লিষ্টতা প্রকাশ পেতে থাকে, তার অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিকের জীবনস্পর্শী চেতনালোক হতে থাকে দীর্ণ ও রক্তাক্ত। [.....] যুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর কালের রক্তিম, স্মৃতি-তরঙ্গিগত হতাশায়-ব্যর্থতায়-বেদনায় ক্ষতবিক্ষত চেতনাপুঞ্জের মধ্যেও এ কারণে আমাদের ঔপন্যাসিকরা সম্ভাবনার বীজমন্ত্র সৃষ্টিতে উদ্যোগী হয়েছেন। অন্ধকার সমাজগহ্বরে তাঁরা সন্ধান করেছেন উত্তরণের প্রাণ-কণিকা।' (পৃ. ২৪৪-৪৫) এ পর্বে ত্রিশ জন ঔপন্যাসিকের বাহাত্তরটি উপন্যাসকে আলোচনায় আনা হয়েছে। বিষয় বিভিন্নতা এ সময়ের উপন্যাসে পরিলক্ষিত হয় ব্যাপকভাবে :

(১) গ্রামীণ জীবনাভিজ্ঞতার ও অভীপ্সার রূপান্তর

(২) মধ্যবিত্তের নবতর জীবন জিজ্ঞাসা

(৩) মধ্যবিত্তের স্বপ্নভঙ্গ, আত্মরতি ও আত্মকুণ্ডলায়ন

(৪) মিথ-ইতিহাস ও ঐতিহ্য অন্বেষা

(৫) রাজনীতিচেতনা

(৬) মুক্তিযুদ্ধ। একই সঙ্গে আঙ্গিকের ক্ষেত্রে দেখা যায়, আরও অধিক পরীক্ষানিরীক্ষা। প্রথাগত আঙ্গিকের অনুসৃতির মধ্য দিয়ে বর্ণনাধর্মিতা, আঞ্চলিকতা রূপ ও প্রতীকধর্মী উপন্যাস রচনার পাশাপাশি বিশ শতকীয় শিল্পরীতির আবির্ভাব ঘটে এ সময়। তাই অন্তর্বাস্তবতার রূপায়ণ, মিথ-ঐতিহ্য, ইতিহাসের পুনর্মূল্যায়ন, আঞ্চলিক জীবনে নব্যবাস্তবতাবোধ আনয়ন ও এপিক ফর্মে যুদ্ধোত্তর নন্দনতত্ত্বের প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাস আলোচনায় অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খানের এ গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাঁরা, 'আমাদের ঔপন্যাসিকরা উপন্যাসের ফর্ম নিয়ে তেমন পরীক্ষায় রত আছেন বলে মনে হয় না। আর শুধু ফর্ম নিয়ে পরীক্ষা করার কিছু আছে বলেও মনে করি না।' (একুশের প্রবন্ধ '৮৮, বাংলা একাডেমি, পৃ. ৩৬, সারোয়ার জাহানের প্রবন্ধ) এ ধরনের মন্তব্য করেন, ডঃ খানের এ গ্রন্থ পড়ে তাঁরা স্বীয় অভিমত পুনর্মূল্যায়নের সুযোগ নিতে পারেন। বাংলাদেশের বাংলা উপন্যাসে আঙ্গিক পরিচর্যা অপেক্ষাকৃত কম হয়েছে, নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা আদৌ আলোচনার বিষয় নয়, এমন ভাবার কারণ নেই। 'শিল্প-রূপের প্রশ্নে, বিষয় সাফল্যের মতো, ঔপন্যাসিকের মনন ও অনুধ্যান সমান্তরাল নয়'। (পৃ. ৩৭৯) এই মন্তব্যের পরও ড. খান বাংলাদেশী উপন্যাসের শিল্পরূপের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিকদের যে রকমারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার দিকে আমাদের দৃষ্টিনিবদ্ধ করেছেন তাতে বুঝা যায়, বাংলাদেশী বাংলা উপন্যাস সার্বিকভাবেই সৃষ্টিশীলতার শীর্ষবিন্দুর দিকে অগ্রসরমান। বিষয়ের ক্ষেত্রে অভিনিবেশ সম্পর্কে সমালোচকদেরও মতান্তর নেই বিধায় এ ব্যাপারে সম্মিলিত আগ্রহতো আছেই। অধ্যাপক রফিকউল্লাহ খানের এ গ্রন্থটি বাংলাদেশীর উপন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে পাঠক গবেষকের অবশ্য পাঠ্য বলে যে-কেউ বিবেচনা করবেন।

সৌমিত্র শেখর*

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়